পৌরুষের সামাজিক ইতিহাস:
ঔপনিবেশিক বাংলায় ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ প্রসঙ্গে, ১৮৮০-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ

সংক্ষিপ্তসার

পিএইচ.ডি. উপাধির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

কলা অনুষদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কিংশুক দাসগুপ্ত

২০২২

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান সন্দর্ভটি ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিম ভাগে বাংলায় জাতিসত্তার নির্মাণ, 'স্বাভাবিক নেতৃত্ব' হিসেবে হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোকের সামাজিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার তাগিদ এবং আধিপত্যবাদী পৌরুষ নির্মাণের গতিশীল প্রক্রিয়াটির আন্তঃসম্পর্ককে উদ্ঘাটন করার প্রয়াসী। উক্ত সম্পর্কটি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে এই সন্দর্ভ ব্রহ্মচর্যের ধারণাটিকে সমস্যায়িত করেছে, যে বিষয়টির সাথে ১৮৮০ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাঙালি হিন্দু পৌরুষের আদর্শ রূপকে সবচেয়ে বেশি সংযুক্ত করে দেখা হয়েছে। এই সন্দর্ভটি প্রাথমিকভাবে উনিশ শতকের আটের দশক থেকে বিশ শতকের তিনের দশকের মধ্যে বাংলা উপদেশমূলক সাহিত্য থেকে পত্র-পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস, জীবনী-আত্মজীবনীতে ব্রহ্মচর্যকে পুরুষের আদর্শ জীবন বিধি হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা লক্ষ করেছে। আলোচ্য সময়পর্বে ব্রহ্মচর্যকে পুনর্নির্মাণের এই প্রবণতাটির সাথে পৌরুষের ওতপ্রোত সম্পর্ককে আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করে এই সন্দর্ভটি প্রাথমিকভাবে উক্ত প্রবণতার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছে। এখানে উল্লেখ্য ব্রহ্মচর্যের নির্মাণের ক্ষেত্রে এই সন্দর্ভে কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটকে নির্ধারণ করা হয়নি, বরং জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশের বিবিধ পর্যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতকে এখানে উদ্ঘাটন করা হয়েছে যেখানে ব্রহ্মচর্যের ভাষ্যটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। ফলত পৌরুষের সামাজিক ইতিহাস রচনার এই প্রকল্পটিতে কিভাবে ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণ হয়েছিল তা অনুসন্ধান করা এবং তার মধ্যদিয়ে পৌরুষ নির্মাণের প্রক্রিয়াগুলিকে অনুধাবন করা, তার নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটগুলিকে চিহ্নিত করা এই সন্দর্ভের প্রাথমিক উদ্দেশ্য থেকেছে।

বর্তমান সন্দর্ভটিতে মূলত চারটি পৃথক ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে ব্রহ্মচর্য এবং পৌরুষের নির্মাণের প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করা যায়। এই বৃহত্তর চারটি ক্ষেত্র হল – ১৮৭০-এর পর থেকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের সাথে হিন্দু আত্মপরিচয়ের সংযুক্ত হওয়া এবং সেখানে পৌরুষের প্রসঙ্গ; স্বদেশি পরবর্তী পর্বের, মূলত ১৯০৯-এর পর থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক সত্তা নির্মাণের প্রক্রিয়া এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক পৌরুষের অবধারণা; ১৯০৫ পরবর্তী বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন তার গণমুখী আবেদন হারানোর পর বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দিকে ঝোঁক বৃদ্ধি এবং এই ধরনের গুপ্ত সমিতিভিত্তিক আন্দোলনে পুরুষ বিপ্লবীদের মধ্যে পৌরুষের অবধারণা; সর্বোপরি ১৮৮০-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রজনন এবং পৌরুষের প্রসঙ্গ। যদিও ব্রহ্মচর্যের পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য এই চারটি পৃথক

পরিসরকে নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু এখানে এই বিষয়টিও স্মরণে রাখা হয়েছে যে ব্রহ্মচর্যের এই নির্মাণ প্রক্রিয়াটি একে অপরের থেকে জলরোধকভাবে বিভাজিত নয়। এদের মধ্যে ধারণাগত নানা সংযোগ অব্যাহত থেকেছে।

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী প্রকল্প, পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতি, প্রথম পর্যায়ের উপনিবেশ বিরোধী বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি এবং বাংলায় স্বাস্থ্যচেতনায় বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতাগুলি ইতিপূর্বের ঐতিহাসিক গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে এবং পৌরুষের নির্মাণের সাথে তার সংযোগটি সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে, বর্তমান সন্দর্ভটি সেই আলোচনাকেই সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করেছে। এখানে লিঙ্গের প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্রে রেখে বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাঙালি ভদ্রলোকের আধিপত্যবাদী প্রবণতার সঙ্গে পৌরুষ নির্মাণের চলমান প্রক্রিয়াটিকে সংযুক্ত করে অনুধাবন করা হয়েছে। ফলত যে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয়ভাবে আলোচিত হয়েছে তা হল কোন প্রেক্ষিতে, কারা ও মূলত কাদের উদ্দেশ্যে আলোচ্য সময়ে ব্রহ্মচর্যের ধারণাটির পুনর্নির্মাণ হয়। আর এর মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচর্যকে আদর্শ করে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষপর্বে বাংলায় কীভাবে আধিপত্যবাদী পৌরুষের একাধিক ভাষ্য তৈরি হয়। এইক্ষেত্রে যদিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমান সন্দর্ভে আধিপত্যবাদী পৌরুষ নির্মাণকে একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়েছে, যাকে কখনো হাসিল করা যায় না। বরং তাকে দেখা যায় একটি সমষ্টিগত উদ্যোগ হিসেবে যার মাধ্যমে লিঙ্গগত উচ্চতর ক্রমপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করা হয়। পাশাপাশি পৌরুষের নির্মাণ প্রক্রিয়াকে বুঝতে হলে লিঙ্গের সাথে অন্যান্য সামাজিক বিষয়গুলিকে কীভাবে সংযুক্ত করা প্রয়োজন এখানে তার উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে। বিশেষ করে এইক্ষেত্রে লিঙ্গের সাথে জাতপাত, সাম্প্রদায়িক আত্মপরিচয় নির্মাণ, বর্ণ, প্রজন্ম এবং অনুভূতির প্রশ্নগুলিকে উত্থাপন করে এবং এর নিরিখে বাঙালি সাবর্ণ হিন্দু মধ্যবিত্তের সামাজিক-রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বৃহৎ প্রবণতার সাথে আধিপত্যবাদী পৌরুষ নির্মাণ প্রকল্পের নির্ধারণমূলক সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান সন্দর্ভে ফলত যে যুক্তিটি প্রতিপন্ন করা হয়েছে তা হল ব্রহ্মচর্যের ধারণার পুনর্নির্মাণকে কেন্দ্র করে বাঙালি ভদ্রলোকের আধিপত্যবাদী পৌরুষের বহুমুখী ভাষ্য তৈরি হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় আদর্শ পৌরুষের ধারণাটিও স্থবির থাকেনি, প্রেক্ষিত এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়পর্বে তার ধারণাটিতেও বদল এসেছে।

বর্তমান সন্দর্ভে চারটি অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়কে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টিতে মূলত ১৮৮০ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুসত্তার নির্মাণের প্রেক্ষিতে ব্রহ্মচর্যের নির্মাণ প্রক্রিয়াকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ গার্হস্থ্যের পরিসরকে যখন বিশেষ একটি নৈতিক বিধির আওতায় আবদ্ধ করতে চেষ্টা করে তখন সেই প্রকল্পের মধ্যে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য আচরণীয় নীতিমালা তৈরি হয়নি। পাশাপাশি পুরুষদের জন্যও একটি নৈতিক বিধি তৈরির প্রয়াস কার্যকরী হয়। বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা যখন ঔপনিবেশিক অধীনতাবোধকে প্রকট করে তোলে, মেয়েলি হওয়ার অপবাদ তার পৌরুষের স্বাভিমানকে আঘাত করে সেই হীনম্মন্যতাবোধ কীভাবে তার পৌরুষ চেতনাকে নির্ধারণ করে সেই দিকটি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলায় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ এইসময় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তা থেকে তার আদর্শগত অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে, যেটি আবার একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী বিশ্বদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইক্ষেত্রে পৌরুষের ঔপনিবেশিক ভাষ্যের প্রতিরোধে বাঙালি মধ্যবিত্ত-সাবর্ণ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব যে বিকল্প পৌরুষের বয়ান খাড়া করতে চায় তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। মূলত আলোচ্য পর্বের খ্যাত এবং অখ্যাত লেখকদের রচিত উপদেশমূলক গ্রন্থ, পত্র-পতিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, আত্মজীবনী, উপন্যাস ইত্যাদি পাঠ থেকেছে প্রধান বিশ্লেষণ পদ্ধতি। এই আলোচনাগুলিকে উপস্থাপন করার মধ্যদিয়ে এখানে যে বিষয়টি সামনে নিয়ে আসা হয়েছে তা হল ব্রহ্মচর্যের একটি বিকল্প ভাষ্য তৈরির মধ্য দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত কীভাবে পৌরুষের একটি প্রতি-আধিপত্যবাদী বয়ান তৈরি করতে চায়। এবং এর মধ্য দিয়ে তারা কীভাবে তাদের সামাজিক নেতৃত্বকে সুনিশ্চিত করার প্রয়াস চালায়। এখানে আলোচনা করা হয়েছে ব্রহ্মচর্যের মধ্য দিয়ে আলোচ্য পর্বে পৌরুষের একটি আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক বিধি নির্মিত হয় যা এই প্রতি-আধিপত্যবাদী বয়ানের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি মুখ্যত স্বদেশি আন্দোলন পরবর্তী বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের সূচনা, হিন্দু সাম্প্রদায়িক সত্তার নির্মাণ এবং হিন্দু পৌরুষের বিষয়টিকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। এইক্ষেত্রে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ হল এই অধ্যায়ের সময়কাল যেখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের সেই অংশকে নিয়ে কথা বলা হয়েছে যারা আলোচ্য সময় থেকে জাতপাত নির্বিশেষে হিন্দু ঐক্যের ধারণা তৈরির তাগিদ অনুভব করে এবং বিপরীতে মুসলমান ‘অপরের’ ধারণাকে পোষণ করতে শুরু করে। এই ধরনের হিন্দু

সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের মধ্যে পৌরুষের সংকটের প্রসঙ্গটি কেন্দ্রীয়ভাবে উত্থাপিত হয়েছে যখন মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসমান এই সাধারণ জ্ঞানটি জনপ্রিয় হতে থাকে। এখানে দেখা হয়েছে এহেন জনসংখ্যাগত সংকটের কল্পনা হিন্দু সাবর্ণ নেতৃত্বর মধ্যে নিম্নজাতি এবং দলিত সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার প্রয়াসকে প্রকট করে, দলিত শরীর হয়ে ওঠে হিন্দু দুর্বল পৌরুষের ধারণার প্রতীক। দলিত সম্প্রদায়ের 'উন্নয়নের' তাগিদ এবং অস্পৃশ্যতার মতো সামাজিক বিধিকে শিথিল করা একদিকে যেমন হিন্দু নেতৃত্বের লক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, পাশাপাশি হিন্দু সাবর্ণ নেতৃত্বর নৈতিক অধিকারের প্রসঙ্গটিও পাশাপাশি প্রকট হতে থাকে। চিত্তাকর্ষকভাবে এই একই উদ্যোগের অংশ হতে দেখা যায় বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গটি। হিন্দু বাল্যবিধবার পুনরায় বিবাহ দিয়ে তার প্রজনন ক্ষমতাকে হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির কাজে লাগানোর প্রয়াস নেয় হিন্দু সাবর্ণ নেতৃত্ব। ফলত এর মধ্য দিয়ে দলিত শরীরের পাশাপাশি হিন্দু মেয়েদের যৌনতাকেও নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালানো হয়। এই হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতর্কে ব্রহ্মচর্য একাধারে হয়ে ওঠে সুস্থ হিন্দু পুরুষসন্তান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যৌনবিধি এবং সাবর্ণ পৌরুষের সামাজিক আধিপত্যের আদর্শগত ভিত্তি। মূলত আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনের ইস্তেহার, পুস্তিকা, ব্রহ্মচর্য বিষয়ক উপদেশমূলক গ্রন্থ, সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত বহু ধরনের প্রবন্ধ, হিন্দু মহাসভার নানা বক্তৃতা ও তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গোয়েন্দা প্রতিবেদন, তাদের সাংগঠনিক চিঠিপত্র ব্যবহার করে এই ইতিহাসটি উদ্ঘাটন করা হয়েছে। উক্ত তথ্যগুলি ব্যবহার করে এই অধ্যায়টিতে আধিপত্যবাদী হিন্দু পৌরুষ এবং তার ব্রাহ্মণ্যবাদী চরিত্রকে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হয় যে পৌরুষ দাঁড়িয়ে ছিল একটি বর্জনমূলক ভাষ্যের উপর।

তৃতীয় অধ্যায়টিতে আমরা বাংলার প্রথম পর্বের বিপ্লবীদের নিয়ে আলোচনা করেছি। বিপ্লবীদের মধ্যে পৌরুষের অবধারণাটিকে অনুধাবন করাই ছিল এই অধ্যায়ের প্রাথমিক লক্ষ্য। সেক্ষেত্রে যেমন বিপ্লবী পরিসরে পৌরুষের পরিভাষা তৈরিতে ব্রহ্মচর্যের ভূমিকাটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, একই সাথে এই বিধিগুলির পাশাপাশি বিপ্লবী পরিসরের দৈনন্দিন আবেগ সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী পৌরুষের নির্মাণে কী ভূমিকা নিয়েছিল তা বোঝার চেষ্টা হয়ে উঠেছে এই অধ্যায়ের অন্যতম বিষয়। ফলত বাংলায় বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বিকশিত প্রথম পর্বের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী পরিসরে পৌরুষের ধরনটি বুঝতে গিয়ে এই অধ্যায়ে তাদের মধ্যে অনুশাসন, অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতি-- এই তিনটি বিষয়ের উপস্থিতির ওপর মূলত আলোকপাত করা হয়েছে। এইক্ষেত্রে যেমন বিপ্লবী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তির দীর্ঘ সূত্রগুলিকে অনুধাবন করার মধ্য দিয়ে বোঝার

চেষ্টা করা হয়েছে কীভাবে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ, ব্রহ্মচর্যের সংকল্প নেওয়া বিপ্লবী পৌরুষের আদিকল্পটি বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে বিকশিত হয়। কৃচ্ছ্রসাধনা, আত্মসংযম, এবং ত্যাগের অভ্যাসের মতো বিষয়গুলি যার সাথে অনুশাসনমূলক প্রকল্পের সংযোগ রয়েছে সেগুলি অভ্যাসের পাশাপাশি এই পৌরুষের অভিব্যক্তিতে দেশমাতৃকার প্রতি আবেগ, সহ-বিপ্লবীদের সাথে বন্ধুত্ব এবং গভীর ভালোবাসা প্রবলভাবে বর্তমান থেকেছে। সুতরাং এই অনুশাসনমূলক প্রকল্প, অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতির প্রবল উপস্থিতির সহাবস্থানকে উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিম পর্বে বাংলায় পৌরুষ নির্মাণের একটি ধারাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। বিপ্লবীদের মধ্যে কীভাবে অনুশাসন, অনুভূতি এবং আবেগ পৌরুষের নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে তা বোঝার ক্ষেত্রে একাধারে বিপ্লবীদের আত্মজীননী, স্মৃতিকথা, তাদের তৈরি ইস্তেহার, বিপ্লবী সংগঠন গুলির নথি, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গোয়েন্দা প্রতিবেদন ব্যাবহার ব্যবহার করা হয়েছে। এই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে উদ্ঘাটিত হয়েছে বিপ্লবীদের ব্রহ্মচর্য এবং নিয়মানুবর্তিতার অন্যান্য পাঠ দেওয়ার মাধ্যমে গুপ্ত সমিতিগুলির মধ্যে অনুশাসনের একটি ধারা তৈরির চেষ্টা কীভাবে কার্যকরি হয়। এই ধারাটি অবশ্যই বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে অনুশাসনের একটি উচ্চতর ক্রমকে দর্শায়। কিন্তু এর পাশাপাশি বিপ্লবীদের মধ্যে হোমো-সোস্যাল বা সম-সামাজিক পরিসর উন্মুক্ত থাকায় তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা এবং অনুভূতি ব্যক্ত করার নানা অবকাশ বর্তমান থাকে। এই সম-সামাজিক পরিসরও পৌরুষনির্ভর বন্ধনকে অভিজ্ঞতা লাভ করার ক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। এই অধ্যায়ে এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে সেই বন্ধনের চরিত্র কখনো থেকেছে বিপ্লবী নেতৃত্বের সাথে কর্মীদের গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মতো উচ্চতর ক্রমনির্ভর, আবার কখনো তা বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা, আবেগ এবং রোমান্টিকতার স্তরেও উত্তীর্ণ হয়েছে যেখানে সম্পর্কগুলি পৌরুষকেন্দ্রিক হলেও সমানাধিকার সম্পন্ন থেকেছে। ফলত এখানে পৌরুষের বিবিধ অভিজ্ঞতা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই একই বিপ্লবীদের দাম্পত্য জীবনের ঝাঁকি দর্শনের মাধ্যমে এই বিষয়টিও উত্থাপিত হয়েছে যে সেখানেও আবেগ, অনুভূতি ব্যক্ত করার মতো বহু মুহূর্ত তৈরি হলেও তা থেকেছে সম্পূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক উচ্চতর ক্রমনির্ভর একটি পরিসর। ফলত বিপ্লবীদের বিবিধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পৌরুষের যে অবধারণাকে এই অধ্যায়ে সামনে আসতে দেখা গেছে তা প্রাথমিকভাবে পৌরুষের আধিপত্যবাদী চরিত্রকে দর্শালেও তার চরিত্র একটি বর্জনমূলক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। সর্বোপরি গার্হস্থ্য এবং তার বাইরে পৌরুষের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা

থেকে এই বিষয়টিও বোধগম্য হয়েছে যে জাতীয়তাবাদ এবং লিঙ্গের প্রসঙ্গটি প্রেক্ষিতনির্ভর বিষয়, যার অর্থ পরিসর অনুযায়ী বদলাতে থেকেছে। ফলস্বরূপ অন্তত বিপ্লবী পৌরুষের পরিসরে অন্দর/বাহিরের এই দ্বৈতের মধ্য দিয়ে লিঙ্গায়িত সম্পর্ককে অনুধাবন করা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়ে মূলত স্বাস্থ্য, পুরুষদেহ এবং তার ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যার কেন্দ্রে আছে প্রজননগত স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গটি। এই বিষয়টিকে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে ১৮৮০ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়কে নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ উনিশ শতকের আটের দশক থেকে জাতীয়তাবাদী স্বাস্থ্যচেতনার বৃদ্ধি চোখে পড়ে এবং যৌনস্বাস্থ্যকে সুনিশ্চিত করতে ব্রহ্মচর্য-পরামর্শ চিকিৎসক মহলে বাড়তে থাকে। আর বিশ শতকের তিনের দশক থেকে *বায়োমেডিসিনের* প্রসার এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রযুক্তির আগমন ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তাকে সীমিত করে দেয়। এইক্ষেত্রে দীর্ঘ ষাট বছরে প্রজননশীল পুরুষদেহের অবধারণার নিরিখে এই অধ্যায়টিতে বাংলায় জনস্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদী প্রতর্কগুলির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। মূলত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিবেদন, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন, চিকিৎসকদের লেখা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পুস্তিকা ইত্যাদির মধ্যদিয়ে জনপরিসরে উঠেআসা এই আলোচনার দুনিয়াকে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। এইক্ষেত্রে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে কীভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকে বাঙালি পুরুষদেহকে নিয়ে জাতীয়তাবাদী উদ্বেগ তৈরি হয় এবং বিশ শতকে সেই লৈঙ্গিক দেহের সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়। মূলত বাঙালির স্বাস্থ্য নিয়ে জনপরিসরে তৈরি হওয়া দেশীয় স্বাস্থ্যজ্ঞ এবং চিকিৎসকদের বয়ান এবং তার বিবর্তনের চিত্রটিকে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে আলোচ্য সময়ে কীভাবে পুরুষদেহের চিকিৎসাকরণ ঘটে এবং পুরুষের প্রজননগত স্বাস্থ্যের সাথে পৌরুষের ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় সেই বিষয়টি আলোচ্য অধ্যায়ে নিরীক্ষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা হয়েছে দেশীয় চিকিৎসকরা ‘ধাতুদৌর্বল্য’কে একটি শারীরবৃত্তীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে যেভাবে বাঙালি পুরুষ প্রজননশীলতা এবং পৌরুষ সম্পর্কে উদ্বেগের আবহাওয়া তৈরি হয়, সেখানে ব্রহ্মচর্য হয়ে ওঠে বাঙালি পৌরুষ এবং তার প্রজননশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম একটি উপায়। স্বাস্থ্যজ্ঞদের আলোচনায় বহু আঙ্গিকে ব্রহ্মচর্যের বিষয়ে আলোচনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে ছাত্র-কিশোর-যুবকদের যৌনাচার হয়ে ওঠে এই আলোচনাগুলির কেন্দ্রীয় বিষয়। তাদের জীবনযাপনের প্রতিটি পর্যায়ের ওপর নজরদারি চালিয়ে তাদের যৌনাচারের নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বয়ানে প্রাধান্য পেতে থাকে। এইক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য হয়ে ওঠে সেই ঈপ্সীত জীবনচর্যার বিধি যাকে

চর্চার মাধ্যমে পুরুষ তার প্রজননক্ষমতা তথা পৌরুষকে ধারণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে কৈশোর এবং যৌবনের প্রসঙ্গটিকে উত্থাপন করে দেখানো হয়েছে উক্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কীভাবে কনিষ্ঠ প্রজন্মের উপর অবিভাবক প্রজন্মের নিয়ন্ত্রণকামী প্রবণতা প্রকট হয়। ব্রহ্মচর্য হয়ে ওঠে একটি আদর্শ যৌনজীবনের বিধি যা পালন করার মধ্য দিয়ে বিবাহপূর্ব ও বিবাহ-পরবর্তী জীবনে সুস্থ সন্তান এবং কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু সন্তানের প্রজননকে সুনিশ্চিত করার আশা করা হয়। ফলত এই বিষয়টি উত্থাপন করে প্রজননকেন্দ্রিক পৌরুষের ভাষ্যকে অনুধাবন করা হয়েছে যা অবশ্যই আধিপত্যবাদী পৌরুষের একটি ভাষ্য তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থেকেছে। পাশাপাশি এই বিষয়টিও নজরে আনা হয়েছে যে বিশ শতকের একের দশকের আগে প্রজননের প্রসঙ্গটি যখন কেবলমাত্র হিন্দুসন্তান প্রজননের প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হয়নি ততদিন এই বিষয়টি পৌরুষের কোনো বর্জনমূলক ভাষ্যের জন্ম দেয়নি। কিন্তু যখন থেকে এর সাথে হিন্দু সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্বেগটি সংযুক্ত হতে থাকে তখন তার চরিত্রতেও পরিবর্তন আসতে দেখা যায়। ফলত সামগ্রিকভাবে এই সন্দর্ভটি ব্রহ্মচর্যকে কেন্দ্র করে বাঙালি ভদ্রলোকের আধিপত্যবাদী পৌরুষের বিবিধ ভাষ্যকে উদ্ঘাটন করেছে এবং এর মধ্য দিয়ে বাঙালি ভদ্রলোকের দেশীয় সমাজে যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা লক্ষ করা যায় সেই বৃহৎ প্রক্রিয়ার সাথে পৌরুষের প্রসঙ্গটিকে কীভাবে সংযুক্ত, বা অন্যভাবে বলতে গেলে বৃহত্তর রাজনৈতিক-সামাজিক পরিসরে বাঙালি ভদ্রলোকের এই আধিপত্যবাদী প্রবণতায় পৌরুষের প্রসঙ্গে আলোচনা কীভাবে প্রাসঙ্গিক সেই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছে।

তত্ত্বাবধায়কদের স্বাক্ষর

প্রার্থীর স্বাক্ষর